জানি ভুলে যাবে যে আমায় : সুধীন দাশগুপ্ত

শাক্য সেন

তখন কিশোর বেলা। হাইস্কুলের মাঝামাঝি ক্লাসের এক কিশোর একদিন মাঝদুপুরে স্কুল পালিয়ে ম্যাটিনি শো'র সস্তা দামের টিকিট কেটে চুপি চুপি ঢুকে পড়েছিল কাছের এক বেড়ায় ঘেরা সিনেমা হলে। সেই তার প্রথম লুকিয়ে লুকিয়ে অপরাধ করার অভ্যেস শুরু। সিনেমার নাম 'হার মানা হার'। স্বাগত বসন্ত তখন তার শরীরে মনে। যে মন সেদিন ভেসে গিয়েছিল সুরের বন্যায়,

কি আনন্দ এই বসন্ত আজ তোমারি এ কুঞ্জের দ্বারে
তুমি দাও সাড়া দাও এসে নাও ডেকে নাও
কেন বসে আছ বন্ধ দ্বারে।

সেদিন থেকেই জীবনের সব দ্বার যেন খুলে গিয়েছিল সেই কিশোরের। সুরের বন্যায় ভেসে গিয়েছিল সেই অপরাধী কিশোর মন। কিন্তু শুধুই কি সুর? শুধুই কি মান্না দে'র অসাধারণ কণ্ঠ আর গায়কী? মন কি একবারও কথার জাদুতে মুগ্ধ হয় নি? যৌবন অতিক্রমের দিনগুলিতে তাই সেই কিশোর মন খুঁজে নিতে ভুল করে নি এ গানের রচয়িতা সুধীন দাশগুপ্তকে। তখন কিন্তু সেই কিশোর জেনে গেছে সুরকার সুধীন দাশগুপ্তের আড়ালে বসে আর একজন কবিতা লেখেন, গানের বাণী রচনা করেন, তিনি হলেন কবি সুধীন দাশগুপ্ত। ৬০/৭০ এর দশকে বড় হয়ে ওঠা বাঙালি তরুণ তরুণীর এ অভিজ্ঞতা কোনো বিচ্ছিন্ন অভিজ্ঞতা নয়, বলা যায় সার্বিক অভিজ্ঞতা। সুধীন দাশগুপ্তকে অধিকাংশ বাঙালি সুরকার হিসাবেই চেনেন কিন্তু কবি সুধীন দাশগুপ্তকে তারা আবিষ্কার করেছেন অনেক পরে। বলা যায় প্রায় চিরকালই তিনি প্রচ্ছন্ন থেকে গেছেন তার সুরকার সত্তার আড়ালে।

সুধীন দাশগুপ্তের (৯অক্টোবর, ১৯২৩) প্রকৃত নাম সুধীন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত। পিতৃপুরুষের আদি বাসভূমি ছিল বর্তমান বাংলাদেশের যশোহর জেলার 'কালিয়া'য়। বাবা মহেন্দ্রলাল দার্জিলিং-এর সরকারি স্কুলের শিক্ষক ছিলেন। কাজেই সুধীন দাশগুপ্তের ছেলেবেলা কেটেছে দার্জিলিং-এর মেঘে ঢাকা পাহাড়ী পরিবেশে। মা-ও ছিলেন সমাজকর্মী।

ফলে একটা মুক্ত মন গড়ে ওঠার মতো পরিবেশেই বড় হয়ে উঠেছিলেন তিনি। যৌবনের শুরুতেই ১৯৪৯-৫০ থেকে চলে আসেন কলকাতায়। ভালো হকি খেলতেন, ব্যাডমিন্টনেও পর পর তিনবার রাজ্য চাম্পিয়ান হয়েছিলেন। তবে খেলাধূলার জগৎ ছেড়ে তিনি চলে আসেন সুরের জগতে। সেকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গীতিকার সুরকার সলিল চৌধুরীর মতো সুধীন দাশগুপ্ত বহু বিচিত্র সাংগীতিক জগতের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। পিয়ানো, মাউথ অর্গ্যান, সেতার- হারমোনিয়ামসহ নানা বাদ্যযন্ত্র অনায়াস স্বাচ্ছন্দে বাজাতে পারতেন। লন্ডনের রয়্যাল কলেজ অফ মিউজিক থেকে সর্বোচ্চ সাংগীতিক সম্মানও পেয়েছেন (মাস্টার ডিগ্রি) তাঁর সাংগীতিক দক্ষতার পরিচয় পেয়ে এইচ.এম.ভি র কর্ণধার ক্ষিতিশ বসু তাঁকে এইচ.এম.ভি তে রেকর্ড করবার জন্য আমন্ত্রণ জানান। সেটা ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দ। বেচু দত্ত সুধীন দাশগুপ্তের সুরে এইচ.এম. ভি থেকে রেকর্ড করলেন 'কতো আশা কতো ভালবাসা' এবং 'কেন আকাশ হতে' গান দুটি। সেই প্রথম বাংলা গানের রেকর্ডের দুনিয়ায় জুড়ে গেল বিগত শতাব্দীর সর্বশ্রেষ্ঠ সুরকারদের অন্যতম সুধীন দাশগুপ্তের নাম। চলচ্চিত্রে সংগীত পরিচালনাও শুরু করেন ১৯৫৭ তে। ছবির নাম 'উল্কা'। এর পরেই তাঁর সংগীত পরিচালনায় মুক্তি পায় বিখ্যাত ছায়াছবি 'ডাকহরকরা'. এভাবেই শুরু হয়েছিল সুরকার সুধীন দাশগুপ্তের জয়যাত্রা। একে একে মুক্তি পেয়েছে 'শঙ্খবেলা', 'তিন ভুবনের পারে', 'প্রথম কদমফুল', 'ছদ্মবেশী', 'পিকনিক', 'হার মানা হার', 'বসন্ত বিলাপ','হংসরাজ'-এর মতো জনপ্রিয় ছায়াছবি। সব কটিতেই সংগীত পরিচলনা করেছেন সুধীন দাশগুপ্ত। এই সব ছবিতে সংগীতের বহুল প্রয়োগ হ'ত। বহু মানুষ নানা সুর বৈচিত্রে ভরা সংগীতের টানেই প্রেক্ষাগৃহে ভিড় করতেন। সুধীন দাশগুপ্তের সুরের মাধুর্য মুগ্ধ করেছিল শচীনদেব বর্মনের স্ত্রী মীরা দেব বর্মনের ঘনিষ্ঠ বান্ধবী জ্যোৎস্না রায়কে। তিনি অত্যন্ত সংগীত রসিক মানুষ ছিলেন বলেই একমাত্র কন্যা মঞ্জুশ্রী দেবীকে বিয়ে দিতে চেয়েছিলেন সেকালের বিশিষ্ট সাংগীতিক ব্যক্তিত্ব সুধীন দাশগুপ্তের সঙ্গে। সিনেমার জগতের লোক, স্বাভাবিকভাবেই গড়পড়তা বাঙালির মতো নির্দিষ্ট সময়ে বাঁধা দৈনন্দিন জীবনে সুধীন দাশগুপ্ত অভ্যস্ত নয় বলেই তাঁকে সেদিন পরিবারের সকলেই পাত্র হিসাবে উপযুক্ত বলে মনে করেননি। তবু শেষ পর্যন্ত মীরা দেবীর ইচ্ছাতেই বিয়েটা হল (২৮ জুন, ১৯৫৮)। সুধীন দাশগুপ্তের তখন বেশ নামডাক, নানা পত্রপত্রিকায় নিয়মিত তাঁর ছবি ছাপা হচ্ছে। রেকর্ডিং-এর দৃশ্য, নায়ক-নায়িকার সঙ্গে আলাপ আলোচনায় মগ্ন সুধীন দাশগুপ্তকে 'উল্টোরথের' পাতায় প্রথম দেখেন মঞ্জুশ্রী দেবী। অনুজ্জ্বল গায়ের রঙ, রোগাটে চেহারা। অপছন্দের বদলে তিনি সেদিন মুগ্ধই হয়েছিলেন। অসাধারণ বাক দক্ষতা থাকা সত্ত্বেও কথা বলতেন কম। মিতভাষী এ মানুষটিকে প্রথম থেকেই ভালো লেগেছিল মঞ্জুশ্রী দেবীর। তিনি নিজেও সংগীত চর্চা করতেন। গান বাজনার জগতের মানুষ ছিলেন বলেই স্ত্রী হিসাবে স্বামীর কাছে অতিরিক্ত সময় কখনো দাবী করেন নি। সুধীন দাশগুপ্ত সংসারে সময় কম দিলেও পারিবারিক কাজকর্ম করার চেষ্টা করতেন। ছেলে মেয়ে আত্মীয় স্বজনের খোঁজখবর নিতেন। ১৯ নম্বর ডি. গুপ্ত লেনের বাড়িতে

তখন নিয়মিত বসত গান বাজনার আসর, চলত নিয়মিত সুরের সাধনা। বলা যায় ৫০ থেকে ৭০ এই তিন দশক জুড়ে সলিল চৌধুরীর মতো নিয়মিত দক্ষতায় নানা কথায় সুর বসিয়েছেন। বিদেশী সুরের নানা ঘরানা সম্পর্কে তাঁর যেমন গভীর ধারণা ছিল, তেমনি ভারতীয় শাস্ত্রীয় সংগীতের নানা সুর ও লোকসংগীতের সুরের মধ্যেও তিনি খুঁজে বেড়িয়েছেন নিত্য নতুন সুরের উপাদান। এই খুঁজতে খুঁজতেই তার হয়তো মনে হয়েছিল নতুন কথা, নতুন ভাব, নতুন শব্দ পেলে তিনিও হয়তো তাতে সুর বসিয়ে বদলে দিতে পারেন প্রথাগত সুরের আদল আর এই ভাবনা থেকেই সুরকার সুধীন দাশগুপ্ত কথার পরে কথা সাজিয়ে লিখতে শুরু করলেন নতুন দিনের নতুন গান।

সলিল চৌধুরীর মতো ভারতীয় গণনাট্য সংঘের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগের সূত্র ধরে তিনি গানের ভাষা বদলে দিয়েছিলেন। ৫০-এর দশকেই যুক্ত হয়েছেন আই. পি.টি.এ-র নর্থ ক্যালকাটা কয়ার-এর সঙ্গে। গণনাট্যের আদর্শে আস্থাশীল শিল্পী একের পর এক লিখে চলেছেন উন্মাদনা আর উদ্দীপনায় ভরা গণ জোয়ারের জীবন সংগীত। কথার ক্যানভাসে সুরের তুলিতে আঁকলেন স্বপ্ন রঙিন উজ্জ্বল দিনের ছবি। কথার যাদুতে মুগ্ধ শ্রোতারা সেদিন শুনেছিল সেই নতুন দিনের শপথ,

তারই সুরে সুরে বাজে গুরু গুরু
হোক গানে গানে পথ চলা শুরু
আজ অন্তর অন্তরে প্রান্তরে প্রান্তরে কণ্ঠে ছড়াব এই গান
ছুটে আয় রে লগন বয়ে যায় রে মিলন দিন
ওই তো উঠেছে তান শোন ওই আহ্বান
আয় আয়রে ছুটে আয় বাঁধন টুটে আনি
মুক্ত আলোর বন্যা।

মুক্ত আলোর বন্যায় একদিন ঠিক ভেসে যাবে এ পৃথিবী। কবি বিশ্বাস করেন ঘুম ভাঙানিয়া পাখি সেদিন ওই অসহায় শৃঙ্খলিত মানুষের কানে কানে শুনিয়ে যাবে প্রভাত সংগীত। তাই ভোরের বাউল এই কবি মানুষের দুয়ারে দুয়ারে কড়া নেড়ে ডাক দিয়ে বলে গেলেন,

আয় সুপ্তি ভাঙাই আয় শান্তি জাগাই
ওই শ্যামল ধরণী হবে ধন্যা
ঐ আকাশে বাতাসে দোলা লাগল
আর জীবনে জোয়ার বুঝি জাগল
তব উজ্জ্বল উচ্ছ্বাসে উদ্দাম উল্লাসে
কণ্ঠে জাগাব এই গান।

একই ভাবনায় ভাবিত কবি প্রায় একই কথা উচ্চারণ করেছেন 'এই ছায়াঘেরা কালো রাতে' গানে। গানটি গেয়েছিলেন দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়। মানব সভ্যতার বুকে নেমে

এসেছে চরম বিপর্যয়। ভয়ঙ্কর অন্ধকার যেন গ্রাস করতে এগিয়ে আসছে এই শ্যামল পৃথিবী। পৃথিবীর আলো একটু একটু করে যেন মুছে যাচ্ছে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির দাম্ভিক আন্দোলনে। কবি পৃথিবীর ছবি এঁকেছেন এইভাবে,

এই ছায়া ঘেরা কালো রাতে
বুক ভরা বেদনাতে
পৃথিবীতে জ্বলে তারা আকাশের গায়
যেন কথা বলে তার সাথে
দিনের পৃথিবী যেন পথের দিশা না পেয়ে
থেমে গেছে চলার পথে

কিন্তু এই তমসাবৃত পৃথিবী কবি চান না, কোনো শিল্পীই চান না, যেমন চান নি ৫০/৬০-এর দশকের গণনাট্যের আলোর পথযাত্রী শিল্পীরা। তাই প্রত্যাশার বেলুন উড়িয়ে কবি মানুষকে শোনান জীবনের গান, আগামী পৃথিবীর গান,

সূর্য আবার উঠবে খুলবে আলোর দ্বার
ভেঙে যাবে এ আঁধার

ক্রান্তদর্শী কবি সুধীন দাশগুপ্তের এ এক শাশ্বত উচ্চারণ। তাই উত্তর প্রজন্মের জীবনমুখী কবি নচিকেতা যখন বলেন 'একদিন ঝড় থেমে যাবে, পৃথিবী আবার শান্ত হবে'। তখন মনে হয় জীবনমুখী গান কোনো নির্দিষ্ট সময়ের ফসল নয়। তা মানুষের আকাঙ্ক্ষার সন্তান বলেই চিরকালের।

সুধীন দাশগুপ্তের কোনো কোনো গান প্রত্যক্ষভাবে গণসংগীত না হলেও গণনাট্যের ভাবাদর্শে বিশ্বাসী জীবনপ্রত্যয়ী গান হয়ে উঠেছে। এগুলিকে বলা যেতে পারে বাংলা গানে গণনাট্যের পরোক্ষ ফসল। তাই 'ছায়া ঘেরা কালো রাতে' 'কালো মেঘের দৈত্য' জীবনকে ধ্বংসের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিলেও কবি সুধীন দাশগুপ্ত গভীর প্রত্যয়ে বলেন,

কোন পাখি তার দুঃসাহসের ডানা মেলে
যায় হারিয়ে অন্ধমনের আঁধার ভেঙে
এই মন সঙ্গী করে আকাশের নীল নগরে
আমিও যাব রে তারই পাখায়
চেনা অচেনার পারে ডেকে ডেকে সে আমাকে
নিয়ে যায় অজানার অভিসারে

অজানার অভিসারে বেরিয়ে কবি কোথায় যাবেন? সাম্যবাদে বিশ্বাসী কবি মন বলেই

তিনি কখনো বলেন না 'আজকে আমার হারিয়ে যাবার নেই মানা' বরং মাটি ঘেঁষা স্বপ্ন ভুবনেই পৌঁছাতে চেয়েছে তাঁর ফেরারী মন। বলেছেন,

ঘর ছেড়ে ঐ শূন্যে ওড়া পাখির মতন
যাব যে সেই বিদেশে যেখানে স্বপ্ন মেশে
সে যদি সামনে এসে দুহাত বাড়ায়।

১৯৬১ তে লেখা এ গানটিতে কণ্ঠ দিয়েছিলেন স্বর্ণকণ্ঠী আশা ভোঁসলে। এ গান শুনতে শুনতে বাঙালি তার যন্ত্রণাকাতর বর্তমানকে পিছনে ফেলে স্বপ্নতরীতে ভাসতে ভাসতে অনায়াসে পৌঁছে যান স্বপ্নভুবনে। আর এই স্বপ্নভুবনই তো ছিল ৫০-৬০-এর ছিন্নমূল, উদ্বাস্তু কর্মহীন ক্ষুধাতুর মানুষের একমাত্র অন্বেষার ভুবন। সুধীন দাশগুপ্ত তাঁর কথা ও সুরে এই স্বপ্নভুবনেই আমাদের পৌঁছে দিয়েছেন।

বাংলা ছায়াছবির জগতে গীতিকার হিসাবে সুধীন দাশগুপ্ত উঠে এসেছিলেন ৫০-এর দশকেই। তবে গীতিকারের স্বীকৃতি পেয়েছেন ৬০/৭০-এ পৌঁছে। 'ছদ্মবেশী', 'হার মানা হার', তা'হলে, 'তিন ভুবনের পারে', 'মঞ্জরী অপেরা', 'সোনার খাঁচা', 'জীবন সৈকতে', 'পিকনিক', 'এপার ওপার' প্রভৃতি নানা ছবিতে গান লিখেছেন সুধীন দাশগুপ্ত। হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, মান্না দে, শ্যামল মিত্র থেকে শুরু করে আশা ভোঁসলে, লতা মঙ্গেশকর, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো সেকালের প্রথম সারির সমস্ত শিল্পীই তাঁর বাণীতে কণ্ঠ দিয়েছেন। তবে ছায়াছবির গানে গীতিকারের কবিসত্তা বা ব্যক্তি হৃদয়ের সংবাদ পাওয়ার সুযোগ কম। তাই কবি সুধীন দাশগুপ্তকে খুঁজে নিতে হয় তার লেখা অসংখ্য আধুনিক গানের কথায়। সে কথায় যেমন প্রেমের ঝরণাধারা উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে। তেমনি নাগরিক মনস্কতার কারণে প্রেমানুভবের গভীরতা কমে এসেছে। বলা যায় সময় অতিক্রমের সঙ্গে সঙ্গে এই গভীরতা যেন ক্রমে ফিকে হয়ে এসেছে। ৫০-এর দশকে রচিত তার গানের কথায় প্রেমিক হৃদয়ের যে আর্তি যে বিষণ্ণতা অনুভব করি ৬০-এর দশকে তা কতকটা ফিকে হয়ে গেছে, ৭০ দশকে তাকে যেন মনে হয় শব্দালঙ্কারে সাজানো এক তাজমহল। ৫০ -এর কবি ১৯৫৪ তে লিখেছিলেন,

এত সুর আর এত গান যদি কোনোদিন থেমে যায়
সেই দিন তুমিও তো ওগো জানি ভুলে যাবে যে আমায়

মিলনের চূড়ান্ত মুহূর্তে বিদ্যাপতি যেমন আসন্ন বিচ্ছেদ বেদনায় লিখেছিলেন ভাবী প্রবাসের কথা তেমনি সুধীন দাশগুপ্ত হৃদয় নিঙড়ানো ভাষায় চরম মিলন মুহূর্তেও উচ্চারণ করেন সেই অমোঘ সত্য,

এ জীবনে সবই যে হারায়
জানি ভুলে যাবে যে আমায়

কিংবা 'এলো বরষা যে সহসা মনে তাই...' ৬০-এর দশকে পৌঁছে বর্তমানের নৈকট্যের মধ্যে আগামী দিনের কার্পণ্যকে খুঁজে পান নি, বরং পরম প্রত্যাশায় আগামী দিনের জীবনপট রচনা করেছেন। সুধীন দাশগুপ্তের কথায় ১৯৬৪ তে মৃণাল চক্রবর্তী গাইলেন,

পথ নির্জন চল না এখন দুজন কোথাও গিয়ে বসি পাশাপাশি
হাতে হাত রেখে চোখে চোখ রেখে
যেখানে তোমায় বলতে পারব ভালোবাসি
যখন তুমি নিজেরি কাছে ধরা দিতে দিতে
নিরুত্তরে থাকবে আমায় চিনে নিতে নিতে
মনে মনে চাইবে তোমার আরও কাছে আসি
হাতে হাত রেখে চোখে চোখ রেখে
যেখানে তোমায় বলতে পারব ভালোবাসি।

এখানে উচ্চারণের স্পষ্টতা আছে, বক্তব্য প্রকাশে সাবলীলতা আছে কিন্তু যে রস বাক্যকে কাব্য করে সেই রসের অভাব সহজেই আমরা অনুভব করি। অনুভব করি কিছু অগভীর বাক্য বিন্যাস। বরং উপস্থাপনার সৌকর্যে অনেক বেশি শ্রোতাকে টানে 'হার মানা হার' ছায়াছবির এই গানটি। ১৯৭২-এ মান্না দে গেয়েছিলেন,

পরো পরো মালা পরো সাজো আমারই এ পুষ্প হারে
চেয়ে দেখো দিগন্ত জুড়ে কত পাখি যায় উড়ে
ঘুরে ঘুরে বহু দূরে ওরা ডাকে তোমারে আমারে
পরো পরো মালা পরো সাজো আমারই এ পুষ্প হারে
তুমি দাও সাড়া দাও এসে নাও ডেকে নাও
কেন বসে আছ বন্ধ দ্বারে

চিত্রনাট্যের প্রয়োজনে এ গানে নাটকীয়তা আছে সন্দেহ নেই। সন্দেহ নেই বন্ধ দ্বারে কড়া নেড়ে বসন্ত যখন এসে দাঁড়ায় তখন পাঠকের মনে হতেই পারে 'আনন্দধারা বহিছে ভুবনে'। তবু এ গানের কথা কি আবেশ জড়ানো কণ্ঠে বলতে পারে,

আমি তো গেয়েছি সেই গান, যে গানে
দিয়েছি এ প্রাণ
ক্ষতি নেই আজ কিছু আর
ভুলেছি যত কিছু তার

আসলে এ এক বিবর্তন, সুধীন দাশগুপ্তের গানের ভাষা একটু একটু করে বদলে যাচ্ছিল। শুধুই কি সুধীন দাশগুপ্ত? গৌরীপ্রসন্ন, পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো গীতিকারদের ক্ষেত্রেও কি এমনটি ঘটে নি। রাজ্য সংগীত আকাদেমির বার্ষিক কার্যবিবরণীতে বাণীর দুর্বলতার

কথা বলা হয়েছে। বাণীর দুর্বলতা কখন আসে ? যখন অগভীর অনুভবের স্তর থেকে কবি কথা বলেন তখনই বাণীর দুর্বলতা তৈরি হয়। সংগীত আকাদেমির বিবরণীতে লেখা হয়েছিল 'আধুনিক বাংলা গানের বাণীর দুর্বলতা বিষয়ে সভা উদ্‌বেগ প্রকাশ করেন'। সুধীন দাশগুপ্তের গানে বাণীর দুর্বলতা ছিল একথা বলা উদ্দেশ্য নয়, কিন্তু বাণীর গভীরতা যে ক্রমশই কমে আসছিল এবং তা যে এককভাবে তারই নয়, এটাও ছিল সময়ের অনিবার্য সাধারণ ধর্ম এ কথা মানতেই হবে। তবে সুধীন দাশগুপ্তের গানের কথায় যৌবনের উচ্ছ্বাস, আবেগের দ্বিধাহীন বিস্তার বরাবরই ছিল। যৌবনের উচ্ছ্বাসে কবি বলেন,

কি নামে ডেকে বলবো তোমাকে
মন্দ করেছে আমাকে ওই দুটি চোখে

কিংবা বলেন

কার মঞ্জির বাজে রিনিঝিনি ঝিনি
মনে হয় যেন তারে চিনি ওগো চিনি
চিনি ওগো চিনি ওগো নন্দিনী
তুমি যে মায়া সঞ্চারিণী

'মায়া সঞ্চারিণী' নারীকে প্রথম দেখার অনুভূতি কবি সুরে সুরে সঞ্চারিত করে দিয়েছেন পাঠক-শ্রোতার মনের গভীরে। শ্যামল মিত্রের কণ্ঠে কবি সেই প্রথম অনুরাগের কথা শোনালেন এইভাবে,

নাম রেখেছি বনলতা যখন দেখেছি
হয়তো বা সেই ক্ষণে তোমায় ভালোবেসেছি
বনলতা কও কথা হয়ো না গো কুণ্ঠিতা
কৃপা থর থর মনে তাই না এসেছি
জলভরা মেঘ ঐ দুচোখে দেখতে আমি পেয়েছি
একলা মনে নির্জনেতে তোমার ছবি এঁকেছি।

গানের কথাগুলি শুনতে শুনতে আমাদের মনে পড়ে যেতে পারে পূর্বরাগের অরুণরাগে রঞ্জিত প্রেমানুভূতির কথা। তবে গৌরীপ্রসন্নের কথায় প্রথম দেখার মুহূর্তে মুগ্ধতার যে আবেশ ছড়িয়ে পড়ে তা কিন্তু সুধীন দাশগুপ্তে খুঁজে পাওয়া যায় না। গৌরীপ্রসন্ন যখন বলেন,

আমি দুর হতে তোমারে দেখেছি
আর মুগ্ধ এ চোখে চেয়ে থেকেছি

সুধীন দাশগুপ্ত তখন বলেন 'নাম রেখেছি বনলতা যখন দেখেছি'। সুধীন দাশগুপ্ত প্রিয় মানবীর চোখের ছবি এঁকেছেন এই ভাবে,

জলভরা মেঘ ঐ দুচোখে দেখতে আমি পেয়েছি।

সেখানে গৌরীপ্রসন্ন লেখেন, 'ছিল ভাবে ভরা দুটি আঁখি চঞ্চল' কিংবা সুধীন দাশগুপ্ত যখন স্পষ্ট উচ্চারণ করেন, 'একলা মনে নির্জনেতে তোমার ছবি এঁকেছি' তখন গৌরীপ্রসন্ন একান্ত আত্মগত ভাষণে আমাদের জানান 'আমি ভ্রমরের গুঞ্জনে তোমারেই ডেকেছি, মনে মনে কত ছবি এঁকেছি'। গৌরীপ্রসন্নের এ গান যেন ইছামতীর প্রবহমান নিস্তরঙ্গ স্রোতধারা — প্রভাত সূর্যের আলোয় ঝলমল। অন্যদিকে সুধীন দাশগুপ্তের কথায় রয়েছে পাহাড়ী ঝর্ণার সুর। গভীরতা কম বলেই দ্রুত লয়ের কনক কাঁকনে তা আমাদের কানকে তৃপ্ত করে, মনে হয় তারুণ্যের চপলতা যেন ঝরণার মতোই পাহাড়ী ঢাল বেয়ে দ্রুত ছন্দে নেমে এসেছে। ফলে গানের কথায় কবি যখন সুর বসিয়েছেন তখন গায়কীতে সেই তারুণ্যের উচ্ছ্বাস ফুটে উঠেছে। যেন প্রেমের চকিত চপল ভ্রুবিলাস আমাদের কান থেকে চোখকে ছুঁয়ে যায়। ভালোবাসার গভীরতা না থাকলেও আমাদের কিশোরবেলার অনেক স্তব্ধ দুপুর সন্ধ্যাকে মনে করিয়ে দেয় এ গানের বাণী।

নিবিড় প্রেমে এক সময় বেজে ওঠে বিচ্ছেদের মেঘমল্লার, বর্ষার জলধারায় ভিজতে ভিজতে বিশ্বভুবন মিলনের মহোল্লাসে মেতে ওঠে, কবি দেখেন,

ওই এলো আকাশ ছেয়ে বরষা রাণী সাজ রে
উড়লো আকাশ মেঘ বিজুরী ঝিলমিলিয়ে হাসে
বাজলো মাদল শোন ময়ূরী সুর যেন তার ভাসে
আজ কেন এ সাজ কেন চোখে কেন এ লাজ রে

এ এক অপূর্ব মিলন মুহূর্ত। অথচ এই নিবিড় ঘন অনুরাগের মুহূর্তেও কবি অনুভব করেন প্রিয় আজ কাছে নেই। মিলনের বাঁশি আজ আর বাজে না। এক নাম না জানা বেদনার দীর্ঘশ্বাস বাতাসকে ভারি করে তোলে। কবি বলেন,

কার তরে এ মন বিবাগী কোন সে ব্যথা অন্তরে
ফুল হয়ে সে উঠলো ফুটে ভুল হয়ে কি যায় ঝরে।

সুধীন দাশগুপ্ত নাগরিক কবি, তাই তাঁর প্রেমের কবিতায় আত্মনিবেদনের গভীরতা কম, বরং ক্লান্তি বিষাদময় অন্ধকার তাঁর কবিতায় কখনো কখনো রোমান্টিকতার বদলে ব্ল্যাক রোমান্টিকতার স্তরে পাঠককে পৌঁছে দেয়। আমরা তখন শুনি গভীর যন্ত্রণায় কবি উচ্চারণ করছেন,

কেন তুমি ফিরে এলে
আমি অন্ধকারে খুঁজে পাইনি যারে
যদি আলোয় তারে পেলে
... ...
সব শেষ হয়ে মন শূন্য এখন
সেই আগের মতো ফিরে দেখি যত

যেন হারিয়েছি সেই দেখার নয়ন
অন্তরে যদি আজ ঝড় ওঠে
যদি সে মুখের ছবি আর নাই ফোটে
আঁধারেই আছি ভেবোনা আর
হৃদয়ে রেখেছি আগুন জ্বেলে।

কবি আঁধারেই আছেন। তাই হৃদয়ের আগুন ধীরে ধীরে নিভে এসেছে। নাগরিক মন এভাবেই নিভে আসে। আমাদের মনে পড়ে যেতে পারে পুতুলনাচের ইতিকথার কুসুমের কথা 'লাল টকটকে করে তাতানো লোহা ফেলে রাখলে তাও আস্তে আস্তে ঠান্ডা হয়ে যায়' এই অনিবার্য শীতলতা নাগরিক জীবনের কবি সুধীন দাশগুপ্ত অনুভব করতে পেরেছিলেন বলেই লিখেছিলেন,

কথার পাহাড় ভেঙে ভেঙে, ক্লান্ত হয়ে গেছি থেমে

তবে ক্লান্তি মুছে ফেলতেও চেয়েছেন তিনি, তিমির রাত্রি অতিক্রম করে খুঁজতে চেয়েছেন আলোর ঠিকানা, বলেছেন,

যে পাখি আঁধার গেছে পেরিয়ে
চোখে আজ শুধু তারই ছবি আঁকি

কিংবা বলেছেন,

সাগর ডাকে আয় আয় আয়
উদ্দাম এই সংগীতে আকাশের শূন্যতা চাই ভরে দিতে

একদা গণনাট্যের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন বলেই হয়তো জীবনের এই উত্তরণে তাঁর বিশ্বাস ছিল। এই উত্তরণ কখনো খুঁজেছেন গণনাট্যের আদর্শে কখনো প্রেম-ফুল জোছনায়। সলিল চৌধুরী যদিও বলেছিলেন,

আজ নয় শুন শুন গুঞ্জন প্রেমের
চাঁদ ফুল জোছনার গান আর নয়
ওগো প্রিয় মোর খোল বাহু ডোর
পৃথিবী তোমারে যে চায়

সুধীন দাশগুপ্ত কিন্তু 'ওই উজ্জ্বল দিন স্বপ্ন রঙীনে'র কথা বললেও প্রেমের কাছে নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ করেছেন,

আমি যে নিজেই মত্ত
জানি না তোমার শর্ত
যদি বা ঘটে অনর্থ
তবুও তোমায় চাই

সে যুগের গানের ভাষার পাশে এ গানের ভাষা অত্যন্ত স্মার্ট অত্যন্ত আধুনিক, গানটির কথাগুলি শুনতে শুনতে আমাদের মনে পড়তেও পারে সুমনের কণ্ঠে সেই কথাগুলি

'তোমাকে চাই'। আমরা কি ভাবতে পারি না সুমনের আসবার প্রস্তুতি শুরু হয়ে গিয়েছিল অনেক আগেই।

নাগরিক জীবনে মুখোশের আড়ালে ঢাকা পড়ে যায় মুখ। 'মুখ ঢেকে যায় বিজ্ঞাপনে'। নাগরিক কবি সুধীন দাশগুপ্তের কথায় শ্যামল মিত্রের কণ্ঠে সেই মুখ আর মুখোশের সংবাদ আমরা পাই। কবি বলেছেন,

চোখের নজর কম হলে আর কাজল দিয়ে কী হবে?
... ...
মানিক যদি না হয় রে মন
মনের মানুষ আসবে না
রূপের ছটায় যে জন ভোলে সে জন ভালোবাসবে না

নাগরিক রূপের মুখোশ নিয়ে কঠিন বিদ্রূপ এখানে উচ্চারিত হয়েছে। কবি দেখেছেন নগর কলকাতার মেকি সভ্যতার আড়ালে একটু একটু করে হারিয়ে যাচ্ছে মানুষের সহজ সাদা-সিধে নিরাভরণ রূপ। শীতল হয়ে আসছে হৃদয়ের উত্তাপ। চমক আর চাকচিক্যে ভরে যাচ্ছে চারদিক, কবি শঙ্খ ঘোষের মতো তিনিও হয়তো বলতে চাইছিলেন,

ভাবি আমার মুখ দেখাব
মুখ ঢেকে যায় বিজ্ঞাপনে

৬০/৭০-এর দশকের দিনগুলিতে নানা দিক থেকে উঠে আসছিল গ্রাম পতনের শব্দ। নগর সভ্যতা ছড়িয়ে পড়ছিল চারিদিকে। নাগরিক বিলাস-স্বাচ্ছন্দ্যের পাশাপাশি এক প্রেমহীনতার জগতে, অবিশ্বাস-সন্দেহের যন্ত্রণাকাতর জীবনভূমিতে মানুষের নির্বাসন ঘটছিল। কবি ব্যক্তিগত জীবনে অনুভব করছিলেন এই ক্রমশ বদলে যাওয়া দিনগুলিকে। নিজের কাছেই নিজে ক্রমশ অচেনা হয়ে উঠছে মানুষ। এই অচেনা মানুষের কথায় সুর বসিয়ে সুধীন দাশগুপ্ত গাইলেন,

কে অজানা কে অচেনা
আজ কিছুতেই যায় না চেনা
হয়তো এমন ভোর হবে না
... ফুল যদি না হাসে

স্পষ্টতই বোঝা যায় নাগরিক জীবনে সম্পর্কের সুতোগুলো ক্রমশই আলগা হয়ে যাচ্ছে। পারস্পরিক এক অচেনা জগতে সেতু ভাঙা দ্বীপভূমিতে আজ আমরা নির্বাসিত হয়ে চলেছি প্রতিদিন। তবু সংকীর্ণ ভালোবাসার সেতুপথে পার হয়ে যেতে চায় দুটি মন। কিন্তু অবিশ্বাস আর সন্দেহের আগুনে প্রতিটি সম্পর্কই ক্রমে অঙ্গার হয়ে যায়। কবি বলেন,

কি হবে কাল তাই নিয়ে আজ ওরা যেন চঞ্চল
নিঃস্বতার এই যন্ত্রণাতে প্রেমটুকু সম্বল
সন্দেহে যে মন সঙ্গীকে যখন বুঝেও তো বোঝে না
কেউ তো জানে না মনেরই ঠিকানা।

আমরা বেশ বুঝতে পারি একান্তই এক অবিশ্বাসের রাতে কবি যেন নিশাচর মানুষের মতোই মনের ঠিকানার খোঁজে বেরিয়ে পড়েছেন। আধুনিক মানুষের এ এক অসহায় মনস্তত্ত্ব।

শহুরে নাগরিক জীবনে মানুষের শেষ আশ্রয় চার দেওয়ালে ঘেরা ছোট্ট একটা ঘর। 'প্রাণহীন এই শহরের ইতিকথা' বিমলচন্দ্র ঘোষও লিখেছেন। সুধীন দাশগুপ্ত এই শহরের ছোট বাক্সের মতো খোপে বিশ্বদর্শন করে বলেছেন,

চার দেওয়ালের মধ্যে নানান দৃশ্যকে
সাজিয়ে নিয়ে দেখি বাহির বিশ্বকে
আকাশ করে ছাদটাকে বাড়াই যদি হাতটাকে
মুঠোয় ধরি দিনের সূর্য তারার রাতটাকে
বিশ্বরূপের দৃশ্য দেখাই চোখের অবিশ্বাস্যকে।

৬০-এর দশক থেকেই মধ্যবিত্ত বাঙালি ফ্ল্যাট বাড়ির স্বপ্নদর্শনে অভ্যস্ত হতে শুরু করে। ১০ বাই ১০-এর ঘরটাতে ছাদটাকে করে নেয় আকাশ। সূর্য - তারার, দিন-রাত সীমাবদ্ধ অভিজ্ঞতায় অবিশ্বাস্যভাবেই নিয়ে আসে সেই ফ্ল্যাটবাড়ির ঘেরাটোপ। সুধীন দাশগুপ্ত এই মধ্যবিত্ত নাগরিক মানুষের কথা আমাদের শোনালেন। বেশ কয়েক দশক আগে এ গান লিখলেও নাগরিক ফ্ল্যাট সংস্কৃতির এ কথা আজও অঞ্জন দত্ত বলেন,

আকাশ ভরা সূর্য তারা আকাশমুখী সার সার
কালো ধোঁয়ায় ঢেকে-যাওয়া ঠাসাঠাসি বাক্স বাড়ি

অঞ্জন দত্তের এই কথাগুলি কী আমাদের একবারও মনে করিয়ে দেয় না সুধীন দাশগুপ্তের চার দেওয়ালের মধ্যে আটকে পড়া নানা দৃশ্যাবলীকে যা তার কাছে মনে হয়েছিল বিশ্বভুবন। আসলে এ ভাবেই পরম্পরা তৈরি হয়। এভাবেই সংস্কৃতির রূপান্তর ঘটে। এভাবেই মানুষের ভাব, মানুষের দিনযাপন- প্রাণ ধারণ পূর্ব প্রজন্মের হাত থেকে রূপান্তরের মধ্যে দিয়ে বর্তমানে পৌঁছায়। আর তখনই সুধীন দাশগুপ্ত থেকে অঞ্জন দত্ত, স্বর্ণযুগের গান থেকে জীবনমুখী গান এক সুতোয় গাঁথা মালার দুটি ফুল বলে মনে হয়।

সুধীন দাশগুপ্তের কোনো কোনো গানের কথা সুর মুখাপেক্ষী নয়। বলা যায় শুধু কবিতা হিসাবেই তার কথাগুলি যথার্থ অর্থেই আধুনিক কবিতা হয়ে উঠেছে। কবি যখন

বলেন 'কলম ঘিরে ছায়ার মতো সঙ্গিনীরা আসে' তখন চিত্রকল্পের ব্যবহার আমাদের মুগ্ধ করে। শুধু বাংলা সাহিত্যে নয় সর্বত্রই গীতিকারেরা পন্ডিত - গবেষক- সমালোচকের কাছে উপেক্ষিত হন। কবির মর্যাদা, স্বীকৃতি গীতিকারের কপালে জোটে না। কিন্তু গীতিকার সুধীন দাশগুপ্ত যখন পাঠককে চমকে দিয়ে লিখে বসেন,

এক ঝাঁক পাখিদের মতো কিছু রোদ্দুর
বাধা ভেঙে জানলার শার্সি সমুদ্দুর
এল আঁধারের শত্তুর

তখন সমালোচকদের তাচ্ছিল্যের প্রবণতা ধাক্কা খায় বৈকি। কোন দুঃসাহসে ভর করে কবি পাখিদের সঙ্গে রোদ্দুরের তুলনা করে বসলেন জানি না। জানি না এই কারণে 'পাখি' ও 'রোদ্দুর' দুই ভিন্ন অর্থ ভিন্ন ছবি আমাদের কাছে বয়ে আনে। তবু তুলনা প্রতি তুলনায় এই শব্দ দুটি ব্যবহার করে সুধীন দাশগুপ্ত সেদিনের বিখ্যাত কবিদেরও চমকে দিয়েছিলেন। আসলে প্রথম সকালের উজ্জ্বল নরম রোদ, যা আমাদের দরজায় জানলায় উঠোনে বারান্দায় এসে পড়ে তা যেন পাখির মতো সুদূর আকাশ থেকে উড়ে এসে ছড়িয়ে যায় আমাদের পৃথিবীতে। এই অর্থেই 'পাখি' হয়ে ওঠে রোদ্দুরের প্রতীক। অন্যদিকে 'শার্সি সমুদ্দুর' শব্দবন্ধটিও একটা বাঁধভাঙা আলোর ছবি এঁকে দিয়ে যায় আমাদের মনের পর্দায়। যেন একটি শব্দের প্রয়োগে এক পরিপূর্ণ আবহ রচনা করলেন কবি। গানটির সঞ্চারীটুকুও অদ্ভুত ভালোলাগার অনুভূতি আমাদের মনে ছড়িয়ে দেয়,

পায়ে পায়ে সন্ধ্যার ক্লান্তি নিয়ে
যারা যায় ফিরে ঘরে শহরে নগরে
পায় কি মনে সূর্যের গতিবেগ
অন্তরাগের ছোঁয়া অন্তরে।

'বন্ধ ঘরের কোন ছাড়িয়ে' যারা সেই সকালে সূর্যের সঙ্গে পা মিলিয়ে পথে নেমেছিল, যারা সন্ধ্যার ক্লান্তি গায়ে মেখে পায়ে পায়ে ঘরে ফিরে গেল তারা কি জীবন জুড়ে সূর্যের গতিবেগ পেল কিংবা 'অন্তরাগের ছোঁয়া' অন্তরে অনুভব করে স্নিগ্ধতর হল— সংশয়ী কবিমনের ভাবনায় উঠে এল আরও একটি ভাবনা- যে মানুষ রাস্তায় পা বাড়িয়েছিল, তাদের মনের অন্ধকার কি কেটে গেল আলোর বন্যায়? প্রশ্নাতুর কবিমন অপেক্ষার প্রহর গোনে,

কান্নাভেজা মন প্রশ্ন চোখেতে
আসবে কবে সেই রাজপুত্তুর

স্বর্ণযুগের গান আর জীবনমুখী গানের মাঝে কোন বিভাজন রেখা টেনে দিয়ে কি স্নিগ্ধতার চিত্রকল্পে ভরা এ গানটিকে বিশেষ কোনো সময়সীমায় বেঁধে ফেলা যায় কি না তা নিয়ে

ভাববার অবকাশ থেকেই যায়। তবে আধুনিক বাংলা কবিতা সংকলনে গানটিকে যে কবিতা হিসাবে সংকলিত করা যায়, তা নিয়ে বিতর্কের কোন অবকাশ থাকে না বলে মনে হয়।

আমরা পেয়ে হারাই, হারিয়ে খুঁজি না। ফলে ইতিহাসের অনেক গৌরবময় চূর্ণিত অধ্যায় প্রত্নতাত্ত্বিকের যাদুঘরে আশ্রয় নেয়। কথাগুলি সুধীন দাশগুপ্তের আলোচনাতেও এসে যায়। এসে যায় এই কারণে গীতিকার সুধীন দাশগুপ্তও আজ প্রণব রায় বা গৌরীপ্রসন্ন মজুমদারের মতো বিস্মৃত হতে বসেছেন। সুরকার সুধীন দাশগুপ্তকে বাঙালি মনে রাখলেও গীতিকার সুধীন দাশগুপ্ত আজ আর নতুন প্রজন্মের কাছে পরিচিত নাম নয়। কিন্তু কেন এমন হল? আমাদের তো মনে হয় স্বর্ণযুগের গানের সঙ্গে ৭০ দশকের জীবনমুখী গানের সেতুপথ যাঁরা গড়ে তুলেছিলেন তাঁদের তালিকায় জটিলেশ্বর মুখোপাধ্যায়ের পরই সুধীন দাশগুপ্তের নামটিই উঠে আসে। বিষয় ভাবনায় এবং শব্দ প্রয়োগে কখনো কখনো চিত্রকল্প নির্মাণে সুধীন দাশগুপ্তের গানের কথা আগামীকে মনে করিয়ে দেয়। তবু গীতিকার সুধীন দাশগুপ্ত হারিয়ে যাচ্ছেন বাঙালির স্মৃতিভূমি থেকে। এর একটা কারণ হতে পারে কবির আত্মপ্রচার বিমুখতা। নিজে লিখে নিজে সুর দিলেও নিজের লেখাটি নিয়ে প্রচার সভায় কখনই যান নি। ফলে জীবিতকালেই কবি সুধীন দাশগুপ্তকে অনেকেই চিনতেন না, এ প্রসঙ্গে ভাস্কর বসু (অরুণ বসু) বলেছেন,

> আমরা যারা সুরকারদের জন্যে গান লিখে বেড়াতাম আমাদের নিজেদের কথা আমরাই প্রচার করতাম। সুধীন দা সব ব্যাপারেই ছিলেন উৎত্তেজনাহীন ঠান্ডা স্বভাবের মানুষ। তাই তাঁর নিজের পক্ষে সুরের বা গীতিরচনা আত্মপ্রসঙ্গ ঘোষণা করার মানুষ তিনি কখনই ছিলেন না।... তাই কোনোও গানের রেকর্ডে কথাও সুধীন দাশগুপ্তের, এমন জানাটা ছিল অপ্রত্যাশিত। সুধীনদা এমন কাজ করতেন মাঝে মাঝে। যদি নিয়মিত করতেন, তা হলে তাঁর এই গীতিকবি অভিধাটি আমাদের চোখে বসে যেত। (সুধীন দাশগুপ্ত/ অশোক দাশগুপ্ত সম্পাদিত)

কাজেই বোঝা যাচ্ছে জীবিতকালেই সুধীন দাশগুপ্তের গান তাঁর নিজের উদাসীনতার কারণেই তেমনভাবে সংরক্ষণ হয় নি। দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতো তেমন কোনো ভান্ডারীও সুধীন দাশগুপ্ত পান নি। ফলে স্বপ্ন রঙিন এক উজ্জ্বল দিন আজ আমরা হারাতে বসেছি। জীবনের এই অনিবার্য পরিণতিটুকু সুধীন দাশগুপ্ত হয়তো জীবনের শুরুতেই অনুভব করেছিলেন অনন্ত সময় সরণীতে 'কতদিন আর এ জীবন/ কত আর এ মধু লগন'। স্রোতের ঢেউ এসে মুছে দিয়ে যাবে স্মৃতির রেখা। একদিন এত সুর আর এত গান থেমে যাবে। তাঁর এই অনুভবটুকু আজও ছুঁয়ে যায় আমাদের হৃদয়ের তানপুরা, আর তখনই মনে হয় সুধীন দাশগুপ্ত যেন গভীর বিষাদে গেয়ে চলেছেন,

আমি তো গেয়েছি সেই গান
সে গানেই দিয়েছি এ প্রাণ
এ জীবনে সবই যে হারায়
জানি ভুলে যাবে যে আমায়।